KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 200	Place of Publication : ৫৮/১২৮ লেক গার্ডেন্স, কল-৪৫
Collection : KLMLGK	Publisher [illegible]
Title অন্যদিন (ANYADIN)	Size 8.5"/5.5"
Vol & Number 18-19 21 22 23	Year of Publication : ১৩৮১ Dec - March 74-75 ১৩৮২ ১৩৮২ Jan - March 1976
	Condition : Brittle Good
Editor [illegible]	Remarks

C.D. Roll No : KLMLGK

কবিতা কেন্দ্রিক ত্রৈমাসিক

অন্যদিন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯ *

সম্পাদক

শিশির ভট্টাচার্য

শীত সংখ্যা ১৩৮২ ● বাইশতম সংকলন

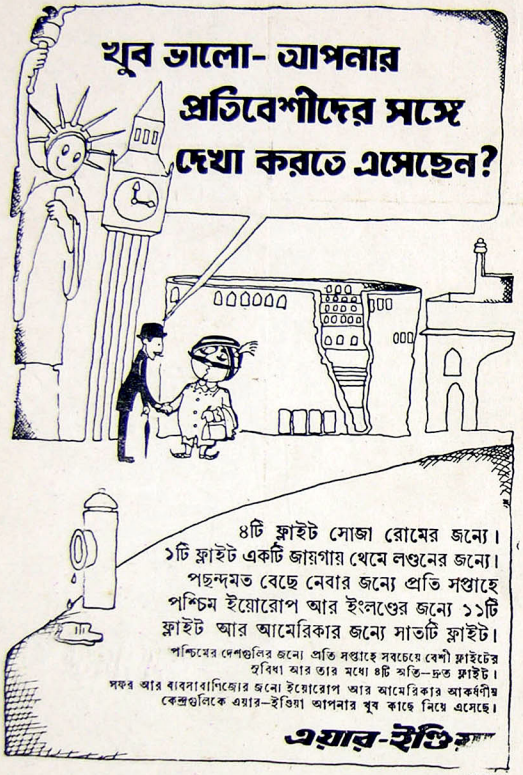

অন্যদিন

TAPAS PHARAI
87/5, Seven Tanks Estate
COSSIPORE CLUB
CALCUTTA-700002

অবৈতনিক সম্পাদক ঃ শিশির ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ জীবন সরকার

অন্যদিন প্রধানত তরুণ গোষ্ঠীর ত্রৈমাসিক কবিতাকেন্দ্রিক মুখপত্র। পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক জীবনধর্মী গল্প, কবিতা ও আলোচনা সাদরে গৃহীত হবে। চিঠির উত্তর পেতে হলে অনুগ্রহ করে ডাকটিকিটযুক্ত নাম ঠিকানা লেখা খাম পাঠাবেন।

●

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৮/১২৮ লেক গার্ডেনস, ক'লকাতা-৪৫
ফোন ৪৬-৩৭১৪।

●

সত্যনারায়ণ প্রেস, ১ রমাপ্রসাদ রায় লেন, ক'লকাতা-৬ থেকে হরিপদ পাত্র কর্তৃক মুদ্রিত ও শিশির ভট্টাচার্য কর্তৃক ৫৮/১২৮ লেক গার্ডেনস ক'লকাতা-৪৫ থেকে প্রকাশিত। প্রচ্ছদশিল্পী ঃ কমল সাহা, প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ ইম্প্রেশন হাউস ঃ ৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, ক'লকাতা-৯

●

দাম ঃ দেড় টাকা

শীত সংখ্যা ১৩৮২
বাইশতম সংকলন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯

অন্যদিন

প্রবন্ধ

সন্তোষকুমার অধিকারী

গল্প

সুশীল রায়

কবিতা

অশোক মণ্ডল * আনওয়ার আহমদ * আশিস শিবনাথ * কিশোর পাইন * চিত্রভানু সরকার * জিতেন চক্রবর্তী * জীবন সরকার * তুষার বন্দ্যোপাধ্যায় * দীপংকর সেন * দেবোপম চক্রবর্তী * নিতাই সেন * পরেশ মণ্ডল * পূরবী বসু * প্রফুল্ল মিশ্র * রাণা সরকার * রবিশংকর গুহ * রুচিরা বন্দ্যোপাধ্যায় * শিশির ভট্টাচার্য।

একগুচ্ছ কবিতা

স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায়

বিদেশী ভাষা থেকে

ফর্মোজা

সিনু-ওয়েন চুং
অনুবাদ ঃ সুজাতা প্রিয়ংবদা

ভারতীয় অন্য ভাষা থেকে
মদেশীয়
পরিমল দে

আলোচনা
জীবন সরকার
তপনায়ন ঘোষ

চিঠিপত্র
তানাজী সেনগুপ্ত
সন্তোষ দাশ

কবি-পরিচিতি
পুরুলিয়া

কবিতার খবর

সন্তোষকুমার অধিকারী

যতীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার অজানা একটি অধ্যায়

দুই

১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি গান্ধীজি আততায়ীর হাতে নিহত হলেন। আমরা বহরমপুরে বসে সেই নিদারুণ সংবাদে মুহ্যমান। পরের দিন সকালে এক বিরাট জনতার মৌন মিছিল শহর পরিক্রমা করলো। সেই মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন নগ্নপদে জেলাশাসক অন্নদাশংকর রায় ও শ্রীমতী লীলা রায়। যতীন্দ্রনাথ বা মণীশ ঘটককে সেই মিছিলে দেখেছি কিনা স্মরণ নেই ; তবে এই মর্মান্তিক ঘটনা যে সকলকে সমানভাবে আঘাত করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

যতীন্দ্রনাথ পড়তে চাইলেন 'মাইণ্ড অব মহাত্মা গান্ধী' গান্ধী বাণীর সংকলন। গান্ধীজির সহজ ও সরল উক্তি এবং সত্যকে একমাত্র দেবতা বলে ঘোষণা, কবিকে অভিভূত করলো। গান্ধীজীর হৃদয়ে সত্য ও অহিংসা একই জায়গায় এসেছে। তাই সে হৃদয় চির-নির্ভয় এবং চির-শান্ত। যতীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন-সায়াহ্নে এসে এমনই একটি ভাবলোককে হয়ত কল্পনা করছিলেন। তাঁর 'সায়ম' গ্রন্থে তার অস্ফুট ইঙ্গিত। ভগবানকে যিনি একদা বিদ্রূপ করে বলেছিলেন যে, জীবনে দুঃখই একমাত্র সত্য ; তিনিই পরবর্তী জীবনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আকুল আহ্বান জানালেন—

"সারা জীবনের নয়নাশ্রুতে
চির সুন্দর, দেখা দাও।"

গান্ধীর উদ্দেশ্যে তিনিই আবার বললেন—

"তুমি এলে সেই শ্যামসুন্দর…"

একদা যে কবি পরম বেদনায় আর্তনাদ করে উঠেছিলেন—

"চেরাপুঞ্জির থেকে
একখানি মেঘ ধার দিতে পারো
গোবি সাহারার বুকে ?

তিনিই পরম বিশ্বাসে গেয়ে উঠলেন—

দেখি ধ্বংসের স্তূপে—
নিরবচ্ছেদ জীবনের ধারা
বহি চলে চুপে চুপে।
বিনাশ ত' তব নহে শেষ কথা,
তা হতে অনেক বড়
আছে আছে এই বিধির রাজ্যে
বিধান মহৎ-তর।

১৩৫৫ সালের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হয় 'গান্ধী বাণী কণিকা'। গান্ধী জীবনদর্শন যেন কবির নিজেরই আত্মবীক্ষণ। যে-কবি সারাজীবন এক বিক্ষুব্ধ হৃদয় নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন, তিনি এখন এক পরম নির্ভরতার মধ্যে মগ্ন। তাঁর এই ঈশ্বর-তন্ময়তার উৎস গান্ধীর—ভগবৎ নির্ভরতা। 'গান্ধী বাণী কণিকা'তে তারই পরিচয় ঃ

"যে দুঃখ আর যে নৈরাশ্য
পড়ে মোর চোখে নিত্য,
ভাগ্যে আপনি ভগবান মোর
ভরিয়া আছেন চিত্ত,—"

এর পরবর্তী যুগে দেখা গেল কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ঈশ্বরতত্ত্ব এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আলোচনায় আকুল। ১৩৫৭ সালের শ্রীপঞ্চমীতে প্রকাশিত হল 'রথী ও সারথি'। কবির আকুলতা এবার এক দর্শনের তত্ত্বে মহিমাময় হয়ে উঠেছে। আর সেই বেদনা নেই। আছে সত্যকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা—

"তুমি, মানে—আত্মা তোমার,
সে যে বন্ধু নিত্য কুমার

ধার ধারে না বাড়া কমার
জন্ম মৃত্যু নাই।"

কিম্বা

"এক কাপড়ে ক'দিন চলে ?
তেমনি দেহ জীর্ণ হলে
সেটা ছেড়ে নূতন দেহ পরি ;"

কবির শেষ কাব্যসংকলন 'নিশান্তিকা' প্রকাশিত হয় ১৩৬৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে। কবি তখন বেঁচে নেই।

কবি যতীন্দ্রনাথের কাব্য সম্পর্কে ইতিপূর্বে কবি বেঁচে থাকতেই কিছু আলোচনা করবার চেষ্টা করেছিলাম। কবিকে আমার ইচ্ছা জানালে তিনি আমাকে লিখলেন—

বহরমপুর—২২.১০.৫২

প্রীতিভাজনেষু,

তোমার চিঠি পেয়ে আনন্দিত হলাম। যদি এসে দেখা করতে পারতে আরও খুসি হতাম। তোমার লেখা নাটিকাখানি প্রকাশিত হলে যেন পড়তে পাই। আমার কবিতা সম্পর্কে যে আলোচনা আরম্ভ করেছ সেটি দেখবার কৌতূহল রইল। আমার সঙ্গে কোনরকম আলাপ না করে আমার কবিতার আলোচনা করাই সমীচীন।

আশা করি সুস্থ আছ। আমার স্নেহাশীর্বাদ নাও।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

'নিশান্তিকা'র কবি

যতীন্দ্রনাথের সর্বশেষ কাব্যসংকলন নিশান্তিকা বার হয় তাঁর মৃত্যুর পর। 'নিশান্তিকা' নামটি কবি নিজেই ঠিক করে রেখেছিলেন। প্রথম যৌবনের কঠোর অগ্নিদাহ তাঁর 'মরীচিকা' 'মরুশিখা' ও 'মরুমায়া'কে যে বেদনার উপলব্ধিতে ঘিরে রেখেছিল, এখানে তার স্পর্শ নেই। ঈশ্বরের প্রতি সেই অবিশ্বাস এবং তীব্র বিদ্রূপের অভিযোগও নেই। আছে আত্ম-সমর্পণ এবং নির্ভরতার বুকে আপনাকে নিবেদন। যদিও কবির সত্যদৃষ্টি কপটতা ও ভাঁড়ামির মুখোসকে তীব্র কশাঘাত করতে সর্বদাই উদ্যত তবু সে আঘাতে যেন তাঁর নিজের হৃদয়ই ক্ষত-বিক্ষত।

কবি যে তাঁর প্রথম জীবনের দুঃখ বিলাসকে অস্বীকার করে রুদ্রের প্রসন্ন হাসির স্পর্শ লাভ করতে উন্মুখ, তার পরিচয় 'নিশান্তিকা'র প্রথম কবিতাটিতেই ঃ

"যে-সুখ বেলি ও চামেলি গন্ধে
অবশ করেছি এ নাসারন্ধ্রে,
সে-সুখ কাঁপছে এ' মোর ছন্দে—
তা যদি মিথ্যা হয়,
যে দুঃখ তবে হৃদয়ে হৃদয়ে
তুষানল সম ধোঁয়াইয়া দহে,
যে-দুখ বীণার ছেঁড়া তার বহে,
কেন তা মিথ্যা নয় ?"

কিন্তু যখন উদ্বাস্তুর ভারে দেশের শাসনতন্ত্র আকণ্ঠ নিমজ্জিত, এবং উদ্বাস্তু সেবার নামে কিছু মানুষের নির্লজ্জ প্রতারণার জাল ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে, তখন কবি গভীর বেদনায় তাঁর মনের জ্বালাকে ব্যক্ত করেছেন এইভাবে—

"দেখে এনু প্ল্যাটফরমে ফরমে
গড়ায় গড়ায় নারায়ণ।
ওপার হইতে তাড়ায়ণ পেয়ে
এপারে আত্মভাঁড়ায়ণ।
আহা যত নর হল নারায়ণ।
... ...
যে যেমন পায় কুড়িয়ে নে যায়,
পতিতোদ্ধারপরায়ণ ;
বাংলায় আর নর মেলা ভার,
যা আছে সেরেফ নারায়ণ।"

১৯৪৯-৫০ সালে আমি কলকাতায় সাপ্তাহিক 'সৈনিক' পত্রিকার সম্পাদক-মণ্ডলীতে রয়েছি। সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম অনুপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এবং সম্পাদক গৌতম সেন আমাকে ধরলেন 'সৈনিক'-এ কবি যতীন্দ্রনাথের কবিতা আনতে হবে। আমার অনুরোধে কবি চার ছত্রের একটি কবিতা

পাঠিয়েছিলেন। ছত্র ক'টি এখানে উদ্ধৃত করছি

"গান যদি তার না থামাতে পারে
সমে অর্থাৎ সময়ে
বুঝিবে কবির মগজ ভর্তি
গব্যে ওরফে গোময়ে।"

এই প্রসঙ্গে কবি একটি চিঠি লিখেছিলেন সম্পাদক গৌতম সেনকে। চিঠিটি উল্লেখযোগ্য। তাই এখানে তুলে দিলাম।

বহরমপুর—২৪. ৬. ৫০

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার ও নৃপেনবাবুর চিঠি আজ পেলাম। আমার প্রতি আপনাদের শ্রদ্ধার পরিচয় পেয়ে কিছু বিপন্নবোধ করছি। আমি যে-জাতীয় লেখক তাতে সাপ্তাহিক কেন, কোন মাসিক পত্রিকারও লেখক বলে গণ্য হ'তে পারিনে। চিরদিনই অত্যন্ত কম লিখে আসছি। এখনও প্রায় লিখিইনে। শ্রীমান সন্তোষ যখন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল, আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—আমি ত কোন লেখা দিতে পারিনে, তবে আমায় 'সৈনিক' কেন পাঠান হয় ? সন্তোষ সুন্দর উত্তর দিয়েছিল,—আমি শুধু পড়বো বলে 'সৈনিক' পাঠান হয়। সেই অবধি 'সৈনিক' পড়ে যাচ্ছি। কখনো আনন্দ কখনো ব্যথা পেয়েছি। আপনার লেখা গান্ধীজির সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা আমায় প্রচুর আনন্দ দিয়েছিল। সম্প্রতি 'নূতন দিনের আলোয়' পড়ে যথেষ্ট আনন্দ পাচ্ছি। অসত্যে অসাধুতায়, পরনিন্দায়, অর্বাচীনের বাচালতায় কর্তব্যবিমুখ তথাকথিত তরুণের আত্মম্ভরিতায় ও শ্রদ্ধাহীনতায় দেশ যখন পরিপূর্ণ তখন সত্যানন্দের নিজের দিকে আলো ঘুরিয়ে নিজেকে দেখার ও দেখানোর প্রয়াস অতিশয় কালোপযোগী মনে হ'চ্ছে।.....

'সৈনিক'-এ প্রকাশ করবার জন্য এখন ৪ ছত্র একটি কবিতা পাঠাচ্ছি। আপনাদের পত্র পেলে ও হাতে লেখা এলে পরে অন্য কিছু পাঠাতে চেষ্টা করবো।.....

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

'নিশান্তিকা'য় আলোচ্য কবিতাটির সঙ্গে অনুরূপ আরও কয়েকটি টুকরো কবিতা আছে—যাকে টপক্যাল কবিতা বলে, তাই। তার প্রতি ছত্রে Irony, প্রতি শব্দে Satire।

যেমন—

"যে-চুরিতে ভাই জেলখাটা নাই
না আগে না পশ্চাৎ,
নিরীহ আমরা বাণীর সেবক
তাতেই পাকাই হাত।"

অথবা

"সাঙ্গ হ'ল রয়্যাল বেঙ্গল বাঘের গলাকাটা,
আর বাহির হইল অস্থি,
ভারত-জোড়া হরিণ ভেড়া ভাবে চুকুল ল্যাটা,
এবার ফিরে পেলাম স্বস্তি।"

অথবা

"সত্য দ্বাপর ত্রেতা
যা কিছু ঘটল যেথা
একটু ভাবিলে পষ্ট হইবে
পেটই ছিল তার নেতা।"
... ...
পেট ছাড়া আর পূজো করিবার
দুনিয়ায় কিছু নাই"

তবু এই বেদনার অশ্রুদগ্ধ পরিহাস নিয়ে 'নিশান্তিকা'র সমাপ্তি নয়। 'নিশান্তিকা'য় বেদনার জ্বালা থাকলেও সংশয় নেই। নির্ভরতার সান্ত্বনা আছে। কবি অসুন্দরের কঠোর মরীচিকা পার হ'য়ে মরুদ্যানের স্নিগ্ধ মাধুর্যে আশ্রয় পেয়েছেন। তাই অভিযোগ নেই, আছে চিরসুন্দরের আবাহন—

"সারাজীবনের নয়নাশ্রুতে—
চির সুন্দর, দেখা দাও।"

সুশীল রায়

রম্ভা

সম্মুখে ভীষণ আর ভয়ঙ্কর এক বিরাট অন্ধকার অজস্র আলোর ফুলঝুরি নিয়ে আস্ফালন করে চলেছে। বিশাল এলাকা জুড়ে তার এই ভীষণ সমারোহ।

সমুদ্র দেখতে এসেছে তারা দল বেঁধে। প্রথমে তারা প্ল্যান করেছিল অন্য রকম। তারা রুম্ভায় বেড়াতে যাবে ভেবেছিল। সেখানে ঘাটি করে তারা চিল্কা হ্রদে নৌ বিহার করবে—এই ছিল তাদের ইচ্ছা।

কিন্তু চিল্কা এলাকায় যখন ট্রেন পৌঁছল রাত তখন গভীর। এই অন্ধকার রাত্রে অজানা জায়গায় নেমে পড়া বিশেষ বুদ্ধিমানের কাজ হবে না বলে হঠাৎ মন্তব্য করে বসল মনোজ।

মনোজ কথা বলে। তাই তার কথার ওজন থাকে। তার মন্তব্য শোনামাত্র দলের সকলের যেন হঠাৎ চৈতন্য হল। তারা তখনই বুঝে ফেলল কথাটা ঠিক।

সুতরাং ট্রেন থেকে নামার দরকার নেই। অতিরিক্ত ভাড়া যা লাগবে তা তারা দিয়ে দেবে। কিন্তু কোথায় নামবে তা ঠিক হলে তবেই ঐ অতিরিক্তের প্রশ্ন।

তারা বেহরামপুর নেমে পড়েছিল। সেখান থেকে চলে এসেছে এই গোপালপুরে।

আসলে, কোনো বিশেষ জায়গাকে কেন্দ্র করে তারা কিছু ভাবেনি। পাঁচ-বন্ধুর এই পঞ্চপাণ্ডব বের হয়েছে কেবলমাত্র ভ্রমণের অভিযানে।

গোপালপুরে এসে সম্মুখে অমন একটা সমুদ্র পেয়ে তারা যেন ধন্য হয়ে গেল।

সমুদ্র তারা আগেও দেখেছে। এটা নতুন কিছু না। পুরীতে দেখেছে, দীঘায় দেখেছে। কিন্তু এখানকার সমুদ্র যেন একেবারে আলাদা জিনিস।

মনোজ একটু শান্তশিষ্ট প্রকৃতির মানুষ। সব ব্যাপারের মধ্যে আছে। কিন্তু কোন কিছুতেই যেন জড়িয়ে নেই।

সে বলল, "দ্যাখ বিষ্টু। এ সমুদ্র যেন একটু আন-সফেস্টিকেটেড। গ্রাম্যতা বলব না, কিন্তু একটু একটু যেন গ্রামীন গ্রামীন ভাব এর সর্বাঙ্গে।

একটু থেমে বলল, "হরেকিষ্টবাবু একদিন বলেছিলেন, চণ্ডীদাসের রাধা শহুরে রাধা, কিন্তু বিদ্যাপতির রাধা গ্রামের মেয়ে।"

বিষ্ণুপদ যেন ঠিক বুঝে ফেলল। অন্যদি, বীরেশ, আর মতিলাল একটু তফাতে ছিল, তাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, "এই—এই মনোজ তো একেবারে মোহিত। প্রেমে পড়ে গিয়েছে।

"কার, কার?"

"গ্রামের রাধার।"

"সে আবার কে?" ওরা এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। জালিয়া যুবতীর দল চলছে বালুতে পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে সমুদ্রের কিনার বরাবর, তাদের দিকে তাকাতে লাগল তারা।

বিষ্ণুপদ বলল, "ওদের মধ্যের কেউ না। এই সমুদ্র।"

মনোজ একটু বেরসিক টাইপের মানুষ! তার জীবনে প্রেম নামক কোনো বস্তু যে থাকতে পারে, একথা বিশ্বাস করাই কঠিন। সমুদ্রের হোক বা ঘরেই হোক—সে যে প্রেমে পড়েছে। এইটেই যেন তাদের কাছে বেশ উৎসাহের ও আশ্বাসের ব্যাপার। ওরা বেশ হাসাহাসি করতে লাগল।

কিন্তু সমুদ্রের কিনারে এইভাবে দাঁড়িয়ে কবিত্ব করলে তো আর চলবে না। থাকার একটা জায়গা জোগাড় করাই হচ্ছে সর্বপ্রথম দরকার।

এসব ব্যাপারে করিৎকর্মা হচ্ছে বীরেশ আর মতিলাল। ওরা ওদের তিনজনকে অপেক্ষা করতে বলে সমুদ্রকে পিছনে রেখে উঠে গেল ডাঙার দিকে।

তারা গেল তো গেলই। তাদের আর ফেরার মতলবই নেই। যেন এই রকম মন হল এদের। এরা রোদ মাথায় করে সমুদ্রের আস্ফালন দেখতে লাগল। মাথায় তেকোণা টুপি পরে ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করছে একপাল মানুষ। সমুদ্রের সঙ্গে ওদের বোধহয় আত্মীয়তা হয়ে গিয়েছে।

অনেকক্ষণ বাদে আবির্ভাব হল ঐ যুগলের বীরেশের আর মতিলালের। উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়ে ওরা ইশারা করে এদের ডাকতে লাগল।

মনোজকে বাঙ্গ করে কবিতর করার মতন বীরেশ বলল, "মহাসমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছিলাম, এবার বুঝি জীবনে তবে নিস্তের করা গেল।" বলে সে হাসতে লাগল।

অর্থাৎ ডেরা তারা পেয়েছে। অদ্ভুত সুন্দর একটা বাসা। তার নাম নাকি অ্যাংকর।

নামটা সার্থকই বটে। একেবারে সমুদ্রের লাগোয়া ছোট্ট বাড়িটা। সমুদ্রের এত ঘনিষ্ঠ কাছে। দ্বিতীয় আর কোনো বাড়ী নেই এ-তল্লাটে।

ওরা সকলে মিলে বাড়িটা যখন দেখল তখন একেবারে যেন অবাকই হল তারা।

বাড়ীটা বড় না। তিনখানা ঘর পাশাপাশি। সমুদ্রের দিকে প্রাচীর। প্রাচীরের নীচেই বালুর স্তূপ জমা হয়ে আছে। ঠিক বালিয়াড়ি বলা না গেলেও অনেকটা তারই মতন। ঐ বালুর স্তূপ পর্যন্ত ঢেউয়ের ছাট চলে আসে গড়িয়ে। অর্থাৎ বিরাট ঢেউ যেন আছাড় খেয়ে এসে পড়ে সমুদ্রের কিনারে, তখন তার ফেনা চলে আসে এই প্রাচীর পর্যন্ত। ও ধাক্কাতেই বোধ হয় প্রাচীরের একটা অংশ ভেঙে নেমে গিয়েছে।

এই বাড়ির নাম অ্যাংকর।

ঠিক। নামটা মন্দ হয় নি। একেবারে নোঙ্গরই বটে। সমুদ্র কিনারে ঠিক নোঙ্গরেরই মতন বাঁধা আছে।

মনোজ তো মোহিত;

কিন্তু মোহিত হয়ে বসে থাকলেই তো চলবে না। সমুদ্রের দৃশ্য দেখে আর সমুদ্রের হাওয়া খেয়ে তো জীবন বাঁচবে না। সুতরাং বাঁচার ব্যবস্থা কিছু করা দরকার।

কিন্তু যে দলে বীরেশ আছে আর মতিলাল আছে তাদের ভাবনা থাকার কথা না।

মনোজ ঘুরে-ঘুরে বাড়িটা দেখতেই ব্যস্ত হয়ে গেল। কিন্তু ঘরে ঘরে নিজেদের টুকিটাকি জিনিসপত্র রেখে জীবন ধারণের ব্যবস্থা করার জন্য বের হয়ে পড়ল ওরা দু'জন:

এ রকম অনেকবার অনেক জায়গায় উদ্দেশ্যহীন ভাবে তারা এই

পঞ্চপাণ্ডবের দল বেরিয়ে পড়েছে, যা-কিছু ব্যবস্থা করার দরকার তার সবই করেছে ওরা দু'জন, সুতরাং ওদের উপর আস্থা এদের সকলেরই আছে। এইজন্যই নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব। তারা তাই গা এলিয়ে দিয়ে ট্রেনের ধকল ভুলবার চেষ্টা করতে লাগল।

বেলা ক্রমেই বাড়ছে। পেটেও আগুন জ্বলছে।

বিষ্ণুপদ আর অনাদি ঘরের মধ্যে বসে আছে। কিন্তু মনোজ গিয়ে বসেছে অনুচ্চ ঐ প্রাচীরে। সেখানে বসে বসে সে তোলপাড় দেখছে সমুদ্রের।

কিছুক্ষণ পরে বীরেশ আর মতিলালের গলা পাওয়া গেল।

সব নিয়ে এসেছে ওরা। কেবল চাল, ডাল, তেল, নুনই নয়। একটি রাঁধুনিও।

মাঝবয়সী এই রাঁধুনির নামটা কিন্তু বেশ। কঙ্কা, তার ভাষা বোঝা কষ্ট। তার নাম সত্যিই কঙ্কা কি না, এ নিয়ে সন্দেহ আছে মনোজের, নামটা লঙ্কাও কিন্তু হতে পারে। কিন্তু কঙ্কাটাই তারা মেনে নিল। এমন পরিবেশে ঐরকম নামই মানায়।

কঙ্কার ভাষা তো একটুও বুঝবার মত নয়, কিন্তু বীরেশ আর মতিলাল তার সঙ্গে বেশ কথা বলে চলেছে।

তার দেশ কোথায় জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, আন্ধ্র।

মনোজ যেন অন্ধকার দেখল।

কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই যেন অদ্ভুত আলো এসে পৌঁছল এই ডেরায়।

মাথায় মাটির কলসী নিয়ে হঠাৎ এ কার আবির্ভাব? চমকেই গেল মনোজ।

অনাদি আর বিষ্ণুপদ পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। অল্প একটু হাসলও বুঝি তারা!

কিন্তু বীরেশ আর মতিলালের কোনো ভাবান্তর নেই। তারা কাজ নিয়ে যেন ব্যস্ত। কঙ্কাকে নানা রকম পরামর্শ দেওয়া নিয়েই তারা বিভোর।

অথচ তারা তাদের বন্ধুদের দেখাতে চায় যেন তাদের কৃতিত্ব কতটা এবং পৃথিবীর উপর কর্তৃত্বই বা তাদের কতটা। এটা তারা একটু উদাসীনভাবে থেকেই দেখতে চায়। এইজন্যে ভীষণ ব্যস্ততার ভঙ্গি নিয়ে তারা রান্নার আয়োজন করেই চলেছে।

সমুদ্রের সৌন্দর্য একটা আছে। গাঢ় নীল বর্ণের সৌন্দর্যই অবশ্য সেটা। কিন্তু গভীর কালোবর্ণের সৌন্দর্যও কতটা গভীর আর নিবিড় হতে পারে তার দৃষ্টান্ত হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে মাটির কলসী মাথায় নিয়ে ঐ মেয়েটা।

কালো কষ্টিপাথরে খোদাই করা যেন ঐ শরীর। খুঁটিনাটি করে দেখলে অনেক খুঁত নিশ্চয়ই বের করা যাবে। কিন্তু সব মিলিয়ে একাকার করে দেখলে আশ্চর্য হবারই কথা।

অনাদি এগিয়ে এল মনোজের কাছে। বলল, "চলন্ত ট্রেনে অমন মন্তব্যটা করেছিলে তার জন্যে তোমাকে বিলম্বিত ধন্যবাদ জানাই। ঐ রাত্রে রম্ভায় যদি আমরা নেমে পড়তাম তা হলে মিলিত কেবল অন্তরম্ভা।"

বিষ্ণুপদ বলল, "আর এখানে এসে সত্যিই পেয়ে গেলাম রম্ভা।"

"মেনকাও বলতে পারিস।" মন্তব্য করল অনাদি।

সতেরো-আঠারো বছরের বেশি নিশ্চয় হবে না ওর বয়স। কিন্তু অতবড় মাটির কলসীটা জলে ভরতি করে মাথায় চাপিয়ে কেবল অনায়াসে হেঁটে চলে এল।

একে নাকি যোগাড় করে দিয়েছে কঙ্কা। সে রান্না নিয়ে, উনুন নিয়ে ব্যস্ত। রান্নার জন্যে জল দরকার, খাবার জল দরকার এসব কথা উঠলে কঙ্কা নাকি একটু হেসেছিল। এক এক কলসী এক এক টাকা তাতেই রাজি হয়ে যায় বীরেশরা। এবং তারই ফলে।

হাত মুছতে মুছতে ঘরের মধ্যে এসে মতিলাল বলল, "কেমন দেখলে?"

হাত বাড়িয়ে দিয়ে অনাদি তার করমর্দন করল, বলল, "পায়ের ধুলো নেওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু উঠতে ইচ্ছে করছে না।" বলে সে পাশ ফিরে শুলো।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলার ভঙ্গি করে বিষ্ণুপদ বলল, "ঠিক। একেই বলে নিশ্চয় গ্রামীণ সংস্কৃতি। অন্যভাবে একে বলা যেতে পারে বিদ্যাপতির রাধা। কি বল হে মনোজ?"

কিন্তু মনোজ কিছু বলল না, সে ধীরে ধীরে উঠে গেল প্রাচীরের দিকে। এখান থেকে অসীম সমুদ্রের চেহারা দেখা যায়। কিন্তু এখন এখানে এসে সে দেখল প্রাচীরের উপর বসে আছে একটা লোক। মাথায় তার তে-কোণা লালি টুপি।

লোকটা নুলিয়া। প্রাচীরের ভাঙা জায়গাটা নিয়ে নিশ্চয়ই সে উঠে

এসেছে এখানে। জল ছেড়ে দিয়ে ডাঙায় এসে বসেছে যে, সামনের ঐ সমুদ্রের দিকে সে চেয়ে আছে।

মনোজ এসে পাশে দাঁড়াল। লোকটা ঘাড় ফিরিয়ে মনোজের দিকে একবার একটু তাকাল। মনোজও কিছু বলল না, লোকটাও কিছু বলল না।

দিনটা কেটে গেল হই-হট্টগোলে। তারপর ক্রমশ নেমে এল রাত্রি। দিনের আলোতে সমুদ্রের চেহারা যেন ঝাপসা হয়েছিল। রাত্রি নামার সঙ্গে সঙ্গে নিজের স্বরূপে নিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এই বঙ্গোপসাগরে। তার গর্জনও গুরুগম্ভীর হয়ে উঠল জ্বলে জ্বলে উঠতে লাগল ফসফরাস।

ওরা চারজন ঘরের মধ্যে বসে অজস্র কথা বলে চলেছে এবং ততোধিক হাসাহাসি করে চলেছে আর এখানে মনোজ একা-একা অনেক রাত্রি পর্যন্ত বসে দেখেছে—সম্মুখে ভীষণ আর ভয়ংকর এক বিরাট অন্ধকারে অজস্র আলোর ফুলঝুরি নিয়ে আস্ফালন করে চলেছে। বিশাল এলাকা জুড়ে তার এই ভীষণ সমারোহ দেখছে মনোজ।

একা একা বসে সে দৃশ্য দেখছে আর ভাবছে ওদের বাইরে বেড়াতে না আসাই ভালো। বাইরে বেড়াতে এসেও ওরা যদি ঘরের মধ্যেই বসে থাকবে তাহলে এদ্দুরে ওদের আসা কেন।

কেন যে ওদের আসা তা ওরা নিজেরা নিশ্চয় জানে। মনোজও যে একেবারে একটুও জানে না তা নয়। ওরা যে কি নিয়ে মেতে আছে তা বুঝতে পারছে মনোজ।

ওই মেয়েটার নাম কি তা জানা হয়নি, তার নাম জানার কৌতূহলও বুঝি কারও নেই। ওরা নিজেরাই ওর একটা নাম দিয়েছে। ওরা ওর নাম দিয়েছে সাগরি।

ঐ সাগরিকে নিয়েই ওরা মেতে আছে। মেয়েটা স্বয়ং অবশ্য উপস্থিত নেই এখন, কিন্তু তবু সেই এখন ওদের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

এখানে ওদের দিন বেশ কেটে যাচ্ছে। কঙ্কা রান্না করে তাদের খাওয়াচ্ছে, এবং তাদের পিপাসার হ্রদ দিয়ে যাচ্ছে ঐ মেয়েটা।

ঘুম থেকে উঠে ওরা দল বেঁধে দোকানে গিয়ে সকালের চা আর খাবার খেয়ে আসে। বেলা দশটা-এগারোটার সময়ে আসে কঙ্কা। তার একটু পরেই কলসী মাথায় নিয়ে চলে আসে ঐ মেয়েটা।

ওর আসা মাত্র বাড়ির চেহারাই যেন বদলে যায়, মেজাজই যেন অন্যরকম হ'য়ে যায়।

মনোজ এ-ঘর ও-ঘর একটু পায়চারি করতে করতে সমুদ্রের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ায়।

প্রাচীরের উপর সেই লোকটা আছে দেখতে পায় সে। বেশ তাজা চেহারা চেহারা এই নুলিয়াটার। জলের জীব সে অথচ অযথা সে উঠে আসে এই ডাঙায়।

কোনো কথা নেই তার মুখে। গম্ভীর হয়ে বসে কী যেন সে ভাবে। সমুদ্রের সঙ্গে এত মাখামাখি করা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত তাকে চেনা গেল না কেন, এইটেও তার ভাববার বিষয় হতে পারে বলে মনে মনে গবেষণা করে মনোজ।

মনোজ সরে আসে। অনেকক্ষণ বাদে গিয়ে দেখে, কখন যেন প্রাচীরের ঐ ভাঙা পথ দিয়ে সে নিচে চলে গিয়েছে।

মেয়েটা নাকি কঙ্কার করতলগত। তার হুকুম নাকি আর সেদিন নেই। এখন এখানে লোকজনও নাকি তেমন আসে না। আগেকার কাল ছিল নাকি রাজার হাল। সমুদ্রের কিনারে লোকজন এখন কম। তাই, এদের রুজি-রোজগারও কমে গিয়েছে নাকি। এদের এখন নাকি খুব অভাব।

কিন্তু সমুদ্রের নাম তো রত্নাকর। তার কিনারে যারা থাকে, এবং সমুদ্র মন্থনই যাদের জীবিকা তাদের তো অভাব হবার কথা না।

অথচ, এদের দেখেই বোঝা যায় এরা দরিদ্র।

দারিদ্র্যের সুযোগ নাকি বহু লোক নিয়েছে, নিচ্ছে এবং নেবে। এটাই নাকি নিয়ম।

মতিলাল নাকি কঙ্কার কাছে শুনেছে এইসব বৃত্তান্ত। হয়তো শুনেছে। কঙ্কার সঙ্গে রান্নাঘরে বসে কত গল্পই যে করে তার বুঝি আর শেষ নেই। কিন্তু এসব কথা কী আর নূতন। এ কথা কে না জানে! এই মহাকাব্য শোনার জন্যে কঙ্কার দ্বারস্থ হতে হবে—এমন কোনো কথা নেই।

ওরা মনে মনে আরও কি-সব ফন্দি আঁটছিল তা ওরাই জানে। ওসব জানার কৌতূহল মনোজের নেই। সে দেখতে এসেছে নতুন জায়গা, তাই সে দেখছে। এতেই তো বেশ খুশি আছে।

খুশি আছে বটে, কিন্তু মাথায় কলসী নিয়ে যখন রোজ দুপুরবেলা ঐ

মেয়েটা এসে দাঁড়ায় তখন তাকে দেখার আগ্রহ কার না হয়, এমন নয়। সেটা বোধহয় আর কোন কারণে নয়, সেটা কেবলমাত্র সৌন্দর্য উপভোগের জন্য। সে সৌন্দর্য উপভোগের করার পর যখন সে অন্য-এক সৌন্দর্যের লোভে এদিকে চলে আসে তখন দেখে সেই তাজা লোকটা জল ছেড়ে উঠে এসেছে, বসে আছে প্রাচীরের উপর।

ওঁরা কি ফন্দি আঁটছিল তা তারাই জানে। কিন্তু ওদের মতলব একটু আঁচ করতে পারছিল মনোজকুমার।

রোজ রাত্রে নাকি জল কম পড়ে যায়। সম্মুখে জলের ঐ বিশাল এলাকা, তবুও পিপাসার জল নাকি তারা পায় না। এই ধরণের একটা ইংরাজি কবিতার লাইন আছে না? আছে বোধহয়।

কঙ্কার সঙ্গে ওরা কথা বলছে। কঙ্কা নাকি একটু হেসেছে। সে নাকি আশ্বাসও দিয়েছে।

মতিলাল বলল, "আমরা যদি পঞ্চপাণ্ডব তবে ঐ সাগরি হচ্ছে আমাদের দ্রৌপদী।"

মনোজের দিকে সকলে তাকাল। মনোজ কি মন্তব্য করে তা শোনার জন্যে তারা উদ্‌গ্রীব হল। কিন্তু মনোজ কিছু বলল না দেখে তারা সরাসরিই তাকে প্রশ্ন করে বসল, বলল "কি হে যুধিষ্ঠির, এ বিষয়ে তুমি কি বল?"

মনোজ বলল, "আমি যুধিষ্ঠির কিনা জানিনে। কিন্তু ওসবের মধ্যে আমি নেই।"

সে কি হে?" মোহিত বলে উঠল, "এক যাত্রায় পৃথক ফল, এটা ভালো দেখায় না।"

মনোজ বলল, "খুব সুন্দর দেখাবে। ত্রিপদী ব'লে ওকে চৌপদী বললেই মিটে যাবে।"

চার বন্ধু হেসে উঠল একসঙ্গে।

সেদিন রাত্রে—একটু বেশি রাত্রেই—সাগরি মাথায় করে জল নিয়ে এসে হাজির হল।

মনোজ চলে এল প্রাচীরের কাছে। উঃ কী ভীষণ সমুদ্র। ফসফরাস আজ যেন ফুলঝুরি নিয়ে খেলা করছে না, মনে হচ্ছে যেন মশাল জেবলে মাতামাতি করছে মাতালের মত। ঢেউয়ের মাথায়-মাথায় আগুন জেবলে হিমসিম করে ছুটোছুটি করছে যেন সমস্ত পৃথিবীটা জুড়ে। যতদূর

পর্যন্ত দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত চলেছে এই কান্ডকারখানা।

ওদিকে ওরা কিসব কাণ্ডকারখানা করছে তা ওরাই জানে।

সমুদ্রের হাওয়া এসে লাগছে মনোজের সর্বাঙ্গে। লবণাক্ত হাওয়া! বেশ লাগছে তার। ঢেউগুলো আছাড় খেয়ে এসে পড়ছে কিনারে, সেখান থেকে গড়িয়ে প্রাচীরের নীচে পর্যন্ত এসে তবে তারা থামছে।

এ যেন এক দীপান্বিতার রাত্রি। সমুদ্রের সর্বাঙ্গে আলোর মালা পরানো। সুবর্ণ দীপমালিনী রাজেন্দ্রানীর মতন তাকে দেখতে হচ্ছে কখনো, কখনো আবার সেই রাজেন্দ্রানীর প্রাসাদের আকার ধারণ করছে।

সারারাত্রি বসে দেখলেও এ দেখার শেষ হবে না। মনোজ অভিভূত হয়ে গিয়েছে। মুগ্ধই হয়ে গিয়েছে সে। অনড় আর অটল হয়ে সে বসে আছে।

প্রাচীরের নীচে এসে যেভাবে আঘাত করছে এই ঢেউ তাতে তার মনে হচ্ছে এর পরে আবার যদি এখানে আসে মনোজ তখন আর এ প্রাচীর কিংবা এ বাড়ি আর দেখতে নিশ্চয় পাবে না। সমুদ্রের ধাক্কায় ভেঙে নেমে যাবে নিশ্চয়!

সমুদ্রের এই দীর্ঘনিশ্বাসের মতন শব্দের সঙ্গে ওটা কিসের শব্দ আসছে তার কানে? মনোজ মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করল। হ্যাঁ, অন্য একটা শব্দই তো! কান্নার শব্দ।

কে কাঁদে? কে কাঁদছে এখানে?

মনোজ উঠে ঘরের দিকে গেল ধীরে ধীরে পা ফেলে। দরজার টোকা দিল।

কিছুক্ষণ পরে খুলল দরজাটা।

মেঝেয় বসে দু-হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সাগরি।

কাকে কি বলবে মনোজ, কিছুই বুঝতে পারল না সে। একা এখানে এই মেয়েটা ওরা চারজন পাশের ঘরে। ওরা কেউ কেউ হাঁপাচ্ছে কেউ হাসছে।

হঠাৎ হাঁটুর মধ্যে থেকে মাথা তুলে মনোজের দিকে একবার তাকিয়েই মেয়েটা শব্দ করে কেঁদে উঠল। তারপর উঠে দাঁড়াল। খোলা দরজা দিয়ে প্রায় দৌড়নোর মতন বেগে সে বেরিয়ে গেল।

এগিয়ে গেল মনোজ। তার কিছু বুঝবার আগেই প্রাচীরের ঐ ভাঙা জায়গাটা দিয়ে সে নেমে গেল অন্ধকারের মধ্যে।

নীচেই ঢেউ ভাঙছে। ওই ঢেউয়ের মধ্যে পড়লে কিছুতে রক্ষে নেই।

প্রাচীরের উপর বুক রেখে ঝুঁকে পড়ল মনোজ ডাকতে লাগল, "এই—এই—এই।"

কিন্তু কোনো সাড়া পেল না। দুই কানে সমুদ্রের হাওয়া শব্দ বাজতে লাগল শন-শন করে। নীচেই বাজতে লাগল ঢেউয়ের আঘাত।

সমুদ্র নাকি সব ফিরিয়ে দিয়ে যায়? ঢেউয়ের টানে যা সে টেনে নিয়ে ফিরতি ঢেউয়ে তা নাকি আবার ফিরিয়ে দিয়ে যায় সমুদ্র। এটা মনোজের শোনা কথা। এটা ঠিক কথা কিনা তা সে জানে না।

আরও দিন দুই তারা ছিল ঐ ডেরায়। কঙ্কা ঠিক এসেছে, কিন্তু জল মাথায় নিয়ে কেউ আর আসেনি।

কী হল তার? কঙ্কাও নাকি তা জানে না। সে যে জানে না, তার জন্যে তার এতটুকু আক্ষেপ নেই। এতটুকু উদ্বেগ নেই।

মানুষ নাকি চিরদিন থাকবার জন্য আসে না। তার জন্যে ভাববার কী আছে, ভাবনার কী আছে। এই যে এরা এসে নোঙর করেছে এই ডেরায়, এখানেই কি এরা বরাবর থাকবে? থাকবে না। এতে ভাবনার কী আছে!

এইসব মহৎ কথা নাকি বলেছে কঙ্কা।

কিন্তু সুবিধে পেলেই মনোজ উঁকি দিয়ে দিয়ে দেখছে—সমুদ্র যা টেনে নিয়েছে তা সে ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছে কি না।

কিছুই চোখে পাড়ানি তার। তাদের এই সফরের কথা চিরদিন মনে থাকবে মনোজের দুটি নিষ্ঠুর জিনিস তার দেখা হয়ে গিয়েছে। তার বন্ধুদের কথা বাদ দিয়েই অবশ্য সে ভাবছে। প্রথম হচ্ছে ঐ সমুদ্র, আর দ্বিতীয় হচ্ছে ঐ কঙ্কা।

তার বন্ধুদের সে ছাড়েনি, কিন্তু তাদের দল ছেড়ে দিয়েছে মনোজ। তফাৎ যে বরাবরই ছিল, কিন্তু এখন আরও তফাৎ হয়ে গিয়েছে।

বীরেশের বিয়ে হয়ে গিয়েছে মাস কয়েক হল। তার দেখাদেখি মতিলালও বিয়ে করে বসল। দলটায় ভাঙন ধরল এইভাবে।

মনোজ আর বাকি থাকে কেন। সেজ খুড়িমা কিছুদিন থেকে চাপ

দিচ্ছিলেন। এবার মনোজও রাজি হয়ে গেল।

বিয়ের পর হানিমুন করার একটা নিয়ম নাকি আছে। মনোজ সে নিয়ম পালন করতে অরাজি নয়। এই উপলক্ষে তবু একটু বেড়ানো হবে। বন্ধুদের দল ছাড়ার পর অনেকদিন বাইরে কোথাও যায় নি। সেও প্রায় বছর দুই হতে চলল।

কোথায় যাবে ভাবছিল। হঠাৎ তার মনে হল রম্ভা। সেবার ঐখানে যাওয়ার জন্যে রওনা হয়েও শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয় নি। সেখানে অন্তরম্ভা যদি জোটে তাতেও ক্ষতি নেই, যাওয়া তো যাক একবার।

মনোজ তার নব-পরিণীতা বধূ মালতীকে নিয়ে চলে আসছে সেই রম্ভায়। জায়গাটা আহা-মরি ধরণের কিছু নয়। তবে, বেশ নিরিবিলি। মধু-চান্দ্রিমা-যাপনের পক্ষে উপাদেয় অবশ্যই।

তারা পরম আরামে আর পরম নিশ্চিন্তে বেশ দিন কাটাচ্ছে এখানে।

তারা চিলকায় বেড়াচ্ছে নৌকা চেপে। এ হ্রদের জল তেমন গভীর না। তবু কেমন গা ছমছম করে।

মালতী তাই নৌকা চাপতে চায় না।

"কেন, সাঁতার জান না?"

"উ হুঁ।"

তারা তাই বিকেল বেলা গিয়ে চিলকার কিনারে বসে থাকে, আর একমনে গল্প করে যায়। কত-যে গল্প করে যায় তার ঠিক নেই। পাহাড়ের গল্প, সমুদ্রের গল্প, ফসফরাসের গল্প।

মনোজ বলল, 'সমুদ্রে যেন আগুন লেগেছে, এই রকম মনে হয়। পুরীতেও অতটা না, দীঘাতে তো নয়ই।'

'তবে এটা কোথায়?' জিজ্ঞাসা করল মালতী। কিন্তু তার কথার উত্তর না দিয়ে মনোজ উঠে দাঁড়াল। ঐ-যে চলে যাচ্ছে নৌকাটা, ওতে দুটো প্রাণী চলেছে। মাছ ধরতে ধরতে চলেছে। যেন চেনা লাগলো মনোজের, খুবই চেনা লাগল তাদের। এখন যদি হাতের কাছে একটা নৌকা থাকত, তাহলে ওদের ধরতে পারত নিশ্চয়ই।

মালতীও উঠে দাঁড়াল, জিজ্ঞাসা করল, 'কি দেখছ?'

'ঐ যে জেলে আর জেলেনি। কী তাজা চেহারা দেখ জেলেটার, আর জেলেনিটার।'

মালতী হাসতে লাগল, 'বিয়ে করার পর থেকে তোমার সবই যেন ভালো লাগছে।'

'লাগছেই তো।'

'ওরাও বুঝি হানিমুনে বেরিয়েছে?' মালতী একটু রসিকতা করার চেষ্টা করল।

কিন্তু মনোজ ভাবছে অন্য কথা, ভাবছে—কথাটা বোধহয় ঠিক, সমুদ্র বুঝি ফিরিয়ে দেয় সবই।

মনোজ বলল, 'একবার বেড়াতে গিয়ে আবিকল ঐ রকম দু'জনকে দেখেছিলাম।'

কে জানে ওরাই কিনা।

• কবিতা

আশিস শিবনাথ

প্রচ্ছায়া

পদাঘাতে পরাজয়ে জর্জর যদিবা
মধ্যাহ্নের পদতলে কেন যে লুটাও!
তার চেয়ে ক্ষমা মাগো শৈশবের কাছে
যে দিয়েছে দীর্ঘকায় সরল বিশ্বাস।

অর্ধবৃত্তে সূর্যমুখী ফিরে চায় পশ্চিম অঙ্গনে
তুমি ফেরো প্রলম্বিত দীর্ঘপদ পুবের প্রান্তরে
এখনো অনেক পথ—আরও দূর রাত্রির আশ্রয়—ততক্ষণ
প্রত্যাগত অবিশ্বাস ফিরে যাক্ নিজের বিবরে;

মুছে যাক্ অহংকার। গেরুয়া সন্ধ্যার
অনবগুণ্ঠিত মুখে নিরাবরণ
তোমার প্রচ্ছায়া, জীবনের দুঃখে সুখে
একাকার এক অন্ধকারে।

রুচিরা বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশ আমার

সূর্যাস্তের লাল আকাশ আমার
ভাল লাগছে না,
ভিয়েতনামের বঙ্গভূমির কথা মনে পড়ে
লাল রঙের সূর্যটা
অহংকারী বোমার মতো
ফেটে পড়ছে,
কোথাও সাদা মেঘের টুকরো
নেই—
কেবলই লাল।

দীপংকর সেন

অধরা মাধুরী

দূর থেকে শিশুদের কলধ্বনি যখন ভেসে আসে,
তার অর্থ বোঝার জন্য কল্পনায় অবগাহন করি না।
যাদের ভালবেসেছিলাম তারা ত প্রায় বৃদ্ধা,
যৌবনের কথা ভাবলে নিজেকে এখন আরো বুড়ো মনে হয়।

তোমায় তবু ছাড়তে পারলাম না,
আজও সবচেয়ে গভীর কথা শুনি
যখন তুমি বল "দরজা খোল।"
কিন্তু দরজা অবধি যাবার আগেই
জানালা দিয়ে দেখি
রাস্তার মোড় পেরিয়ে তুমি চলে গেছ।

দেবোপম চক্রবর্তী

প্রত্যাশা—প্রত্যাশা

মাঝে মাঝেই তো শেষ ট্রেন এক
বাঁশি বাজিয়ে ভিতর বুকের
ষ্টেশন ছেড়ে যায়! তখন
আজ-কাল-ভবিষ্যৎ
তোলপাড়—তোলপাড়
তোলপাড় অভিযান।

মাছরাঙার নাম বেঁচে থাকা,
সে সব জেনেও যেন
একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে
অজান্তে পূর্বাভাস।

পৃথিবীর সব নবজাতকের
জন্মলগ্নে কবিতার আশ্বাস,
সব মৃত্যুই একদা কেমন
গল্প হ'য়ে যায়।

জীবন একটা শিল্পকর্ম,
জীবন আসলে রম্য রচনা।
গোপনে তাকে লুকিয়ে রাখে
অন্যদিনের অনন্য প্রত্যাশা।

আনওয়ার আহমদ

হে নারী, তুমিই বলো

পাহাড় থেকে পাহাড়ে
সমুদ্র থেকে সমুদ্রে
যেখানেই যাই
আশ্রয় চাই।

পাহাড় বলে ঃ
সমুদ্র বলে ঃ
হেথা নয়
হেথা নয়।

হে নারী, তুমিই বলো
আমি কোথায় যাই
কোথায়, আশ্রয় পাই
কোথায়, কোথায়?

চলে যাবো, চলেই যাবো

এক টুকরো কাগজ
একটা আলপিন
ঝিনুকের একটা বোতাম
একটা ম্যাচের কাঠি

রবিশংকর গুহ

বাস্তব চিত্রে

গাদায় ঠাসা বন্দুকে
একবিন্দু সুখ
ড্যাবা ড্যাবা চোখে ফোটে,
তোমার লোহিত মুখ
দুইই সমান বীর
পার্থিব জগতের মিছিলে
আমরাও নই ধীর
যদি না পড়ি পিছিলে ।।

নিতাই সেন

হাসানের কুমারী মিস্‌ট্রেস্‌কে

হাসান তোমার মিস্‌ট্রেস্‌
ময়ূরের পেখমের মতো খোলারোদে ভেসে
আর কোনোদিন স্কুলে আসবে না ।
কোনোদিন স্মৃতি তাকে বানাবে না তুমুল প্রখর !
ফ্রি-স্কুল স্ট্রীট আর কোনোদিন
তোমার কুমারী মিস্‌ট্রেস্‌কে দেখে
কণ্ঠে গাঁথবে না, স্বরচিত দুঃখমালা, প্রার্থনা সঙ্গীত ।

কে তুমি শব্দময় বিন্যস্ত বিষাদ ? কুমারীত্বে কত সুখ ?
কে তুমি বিনম্র দুঃখের নদী, ক্ষোভ বাসিন্দা
তোমার কুমারী মিস্‌ট্রেস্‌ বোশেখেই বিরহের ভরা ঘট
শ্রাবণ তো ডুবে আছে ব্যর্থতার বিষে !
কেউ কি, কোনো স্ট্রীট কি, কোনো লোকালয়
বা সন্ধানী চোখ কি
কুহেলী কাঞ্চন থেকে

সমূহ পতন থেকে
গাঢ় অন্ধকার থেকে—
কুমারীকে টেনে তুলে বলবে সহাস্যে
হে ভালোবাসা শতাব্দীর ক্ষুধিত জিরাফ
তুমি বিপন্ন মিস্‌ট্রেস্‌কে দয়া করো, দয়া করো, দয়া করো ।

চিত্রভানু সরকার

স্মৃতিগুলি গভীর যন্ত্রণায়

এক একটা স্মৃতি যন্ত্রণায় গভীর হয়ে থাকে
দুঃখের সময় কথাগুলি স্পষ্ট হয় মনে
যেন ফেলে আসা ছায়া—নাম লেখা স্টেশান
সাহসী রোদে ছিল সেখানে এক কিশোরী
দশ কি এগারো বড় চঞ্চল প্রজাপতি
তার মুখে আড়াআড়ি হিরণ্ময় দ্যুতি ।
মাথার উপর নীল শাড়ী বিছানো আকাশ
মহুয়া কিংবা কেয়ার ঝোপে হাজার ফড়িংয়ের খেলা ।
হঠাৎ সময়ের কাঁটা মনে করে দেয়
সফল দিনগুলি সব স্মিত গিয়েছে চলে ।

পূরবী বসু

আমার এ মন খেলায় মেতেছে

আমার এ মন খেলায় মেতেছে
সেখানে
যেখানে মাঠে ময়দানে
রোদ্দুর তার বিছানা পেতেছে ।
কত কি যে খেলা—একা সারাবেলা—

কেটে গেল দিন
কাটবে রাত ?
হারানো প্রয়াসে
তাতে শুধু তুমি

তোমার মনের শত শ্রাবণের
রিমি ঝিমি ঝিমি।
স্বপন ধারায় টুপ্ টুপ্ টুপ্
নব বর্ষায় এ মন হারায়
কার ? ময়ূরী ময়ূর তোমার আমার
চলো আজ মোরা সারাবেলা গাই বৈরাগী সুরে
রোদ্দুর আর বর্ষা শ্রাবণ যাবে দূর থেকে আরো দূরে।

জিতেন চক্রবর্তী

আমায় ডাকছ কেন

আমায় ডাকছ কেন
বাজিয়ে নূপুর
কথা বলা এখন বারণ
গান ভুলে গেছে আজ
উদাসী চারণ
লাল দিগন্তে দেখো
সন্ন্যাসী দুপুর।

প্রফুল্ল মিশ্র

ডাক বাংলোর বুক কাঁপে

কৃতঘ্ন শব্দেরা সব পেছু হেঁটে গেছে
ত্রিকালজ্ঞ ট্রাফিকের সিগন্যালে
অথচ একদা—
ক্ষেত-মাঠ-চৌকাঠ ডিঙিয়ে

হেঁটে যাবে বলে সেই শব্দেরা
শবদেহ বয়ে নিয়ে যেতে তৎপর

সময়ের আউটিঙে
ত্রস্ত বিড়ালের কানে শব্দের তরঙ্গ ছোটে যতো
সাইরেন বেজে ওঠে ঃ
ডাক বাংলোর বুক কেঁপে যায়।

তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়

তার সুখ ছিল হাতের মুঠোয়……

তার সুখ ছিল হাতের মুঠোয় দুঃখ ছিল ঘরের বাহির
অফুরাণ প্রাণবায়ু বুকে ছিল অবিনাশী স্মৃতির বৈভব—
সফল দিনের জয় দেহ জুড়ে লম্বমান সহজ বিশ্বাস
তার সুপ্ত চেতনায় ঢেউ তোলে সংসারের বিজয়-কাহিনী
অমিত সৌভাগ্য নিয়ে সুখী ছিল, লোকে বলতো বিষাদ-হরণ।

বিচিত্র জীবন নাকি প্রতিপদে লিপ্ত হয় জটিল খেলায়
অদৃশ্য সুতোয় ধরে টান দেন আমাদের বিধাতা-পুরুষ ;
তার সব সুখ এখন বাহিরে খোলা বুকে দুঃখের কপাট।

কিশোর পাইন

আমি একটা গাছ বুনব

এত ফুল দিয়ে আমি কি করব
টবে ফুল, ফুলে ফুলে রাত্রির সজ্জা
ধূপ পড়ছে নির্বিরাম, হাসছে রজনীগন্ধা

ঝিনুকে ঘি রেশমের সলতে…
আমাকে কার মুখ দেখাতে চাও

সব সামনে থেকে সরা
নয়ত ভাঙবে রুপার থালা

আমি একটা গাছ বুনব, ফুল ধরবে
ফল হবে, পাখীরা বসবে ডালে,
সবাই মিলে ছায়ায় বসে গল্প করতে
পারব।

পরেশ মণ্ডল

কবিতা '৮২'

কথা ছিল, বাকী বসন্তগুলো তেম্নি করে
তেম্নি করে ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চীর মত কাটিয়ে দেবো।
কথা ছিল পাতার আড়ালে থেকেও
অদৃশ্য তৃণের আঘাত রুখবার মত
ভালবাসার বর্ম পরে নেবো।

কথা ছিল—

এখন উপোষী দুপুর ফেলে আসা
বসন্তকে
কেবলই জাবর কাটে। সেইদিন
পলাশ শিমুল যত লাল ফুল—
হৃদয়ের পিণ্ডের মত ছড়া হাসি গান
নরম ভালোবাসা
সব কিছু পাশে রেখে
কথা ছিল আমরাও একদিন
দুহাতে পাথর ঠেলে পুঁতব ফসল।

অশোক মণ্ডল

দেখবে আলোকিত ঘরে পা রেখেছি

তুমি আমার কাঁধ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছো যেন আশ্চর্য প্রতিমা—
তুমি ডাক দিলেই কি আমি ভেতরে যেতে পারি
তুমি ডাক দিলেই কি কলহাস্যে
টুকরো টুকরো হয়ে যাবে শরীর
মাথার চুলে বিলি কাটতে থাকে সুখ
অথচ আমি কি করে যাই!
তুমি আমার কাঁধ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছো যেন অভিমানী ভালবাসা—
অন্ধকারের ভেতর আলোর তীব্রতা আমি বারবার অনুভব করতে চাই
আমার আরেক কাঁধে হাত রাখুক দুঃখ
দেখবে চৌকাঠ ডিঙিয়ে আমি তোমার আলোকিত ঘরে পা রেখেছি।

রাণা সরকার

স্বগতোক্তি

বসন্ত আবীরে তাকে রাঙানো যায় না
এলোচুলে ফেরারী হাওয়ায় দোলে উদাসী আখড়ার সংকেত
আকাশের ছাদে হেঁটে যাওয়া সাতরঙা মিছিলের কণ্ঠ মিলিয়ে
তার স্বগতোক্তি কানে ভাসে

উজ্জ্বল নক্ষত্রের দেশে বন্দী ভালোবাসার
মুক্তিস্নানে চলি।

জীবন সরকার

কাল সানঝি বেলায়

যাই যাই করে যাওয়া হল না
কাল সানঝি বেলা।
কুটুম আয় কুটুম আয়
লুকিয়ে ডাকে শিকলি কাটা।
কে ফিরে, কে যায় তখন
যাই যাই করেও—।

বস্তুত আমার সঙ্গে

বস্তুত আমার সঙ্গে ঈশ্বরের কোথাও
বিরোধ নেই কিংবা শয়তানের। কেননা
প্রত্যূষে প্রদোষে নিয়মের অত্যন্ত অধীন
অর্বাচীন শরীরটাকে গন্তব্যে নিয়ে যেতে
যে খিদমৎ আমাকে যোগাতে হয়
অর্ধেকে তার ঈশ্বর পারেন কিনা
জানা নেই অথবা শয়তানও। কারণ
প্রকৃতি নামক এক যুক্তিকানা কাঠগোঁয়ার
কর্ত্রীর অমোঘ বিধান ঈশ্বর, শয়তান এবং
মানুষের প্রতি সমপ্রযুজ্য পক্ষপাতহীন ।।
একদা বর্ষণ-মুখর শীতার্ত রাত্রিতে বেপথু সন্ত্রাসে
একত্র সহবাসে শূকর শাবক আর মানবক আমি
পাশাপাশি প্রহর গুণেছি। এবং প্রভাতে বিস্ময়ে
দেখেছি আশ্রয়দাতা সেই বটবৃক্ষতলে
হতাদরে শুয়ে এক ঈশ্বরের প্রতিভূস্বরূপ
দেবশিলাপট। প্রকৃতির কঠোর নিয়মে
একইভাবে একত্রে তিনজনে সারারাত
একা একা শীতার্ত মুহূর্তগুলি প্রবল সহেছি।
এবং এখন যেন কোন এক মায়াজালে
পরস্পর আত্মীয়তা অনুভব বুঝি। বস্তুত
আমার সঙ্গে ঈশ্বরের কোথাও বিরোধ নেই
কিংবা শয়তানের। কেননা প্রত্যূষে প্রদোষে……

স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায়

প্রার্থনা, তবুও

কতদিন তুমি বিস্মৃত আমায় !
চৈত্রবেলার ফুল ঝরে গ্যাছে, খড়ির দাগের মত
মুছে গ্যাছে পৃথিবীর পুরাতন রেখা ;
দুঃস্থ নদীর পাশে খড়কুটো নেই,
স্বপ্নের মিনারগুলিও ভেঙ্গে গ্যাছে
পাখীর ডানায় !

এখন কেবলই মনে হয় ঃ
দুজনের মন থেকে দুজনের, গোলাপের মত
গোলাপী হৃদয় চলে গ্যাছে দূরে,

বুকের উঠোন জুড়ে তবু
শস্যের প্রার্থনা পড়ে থাকে,
বসন্তের হাওয়ায় !!

অন্ধকারে স্মৃতি

ভ্রূভঙ্গ মেঘমালা, বিষণ্ণ বিকেলের অন্ধকারে
অতীতের বয়াসিনী হাত ঘোরে ফেরে,
পান্নার গাঢ় রঙ ফোটে সবুজ পাতায়,
হৃদয়ের ভাবনারা ভাসে স্বপ্নের কারুকাজ
ধূসর প্রাসাদে ; অথবা মিশরে,
অতিপ্রকৃত হাওয়ায়।

শৈশব, কৈশোর, সূর্যের উদ্ভাসন,
শাদা-পায়রা-ওড়ানো রাত,
পরস্পর ঘনীভূত ;
বন্দিনী রাজকন্যার উদ্ধারণ গল্পের মতন,
প্রসন্ন বেদনায় বিগত সেইসব সময়ের সৌরভ ফেরে
হাতে নিয়ে বালিকার
অভিমানী ফুল !

হঠাৎ তখনি নির্ভুল
মনে পড়ে, জংলা ঘাসের গন্ধে
পাখীডাকা বেলা,
পুতুল খেলার সঙ্গিনী,
কানামাছির ত্রাস্ততা, বাঁশপাতার নূপুর,
এই সব কী রকম ছায়ার শরীর নিয়ে আসে,

হৃদয়ের অস্তিত্ব ডোবে ঃ
স্মৃতির হলুদ আঙুলে,
প্রান্তরের মন ছুঁয়ে সোনার হরিণ
করে খেলা ।।

সেই তুই বারান্দার

শ্রাবস্তীনগরে কিম্বা কুরুপাণ্ডবের দেশে কোনদিন,
আমাদের পরিচয় ঃ
তখন কুয়াশা প্রোথিত চারিদিকে,
জনপদে নেমেছে আকাশ কলরবহীন,
বুকের ভেতরে অনিবার্য নির্জনতা আছে ।

মনে হয় ! তুমিই পরম প্রাপ্তির মত আমার সোনালী
শরীরের কাঞ্চনমণি ছুঁয়েছিলে,
তোমার চুম্বন, প্রবাল অধর ঘিরে
উষ্ণতায় চিত্রিত আদর ;

তারপর সেই ক্ষণ আর নেই ঃ জন্মান্তরের মতন দুজনেই
চলে গেছি বিচ্ছেদের গ্রন্থি বেঁধে পৃথিবীর
অন্য কোনখানে, সেখানে ফোটেনাকো চুনীফুল,
হীরের মতন তীক্ষ্ণ রোদ ঝরে নাকো বসন্তের মাসে !

তারও পরে হঠাৎ এখানে ঃ মুগ্ধ মুখোমুখি, অপ্রস্তুত চোখে
ফেলে-আসা গোধূলির মদিরতা নামে,
তোমার বিস্ময় ! তুমি কি আমায় চেন নাকি ?
তখনই বলেছি হেসে ঃ আমিও ভুলিনি,
এ পৃথিবী ভোলেনিকো তারে, ভোলেনাকো, যদিও সে
অন্ধকারে ফুটে-থাকা নক্ষত্র-কাহিনী ।।

স্বগত-সংলাপ

আমার আঙুলে আগুন ছিল ঃ
আমার আঙুল ছুঁয়ে তুমি বহুকথা বলেছিলে,
অঘ্রাণের কুয়াশা মরেনি আকাশে,
স্তব্ধতায় সমাহিত রাত ;
সেই রাতে তুমি বড় কাছে ছিলে ।

কী কোরে নতুন দিগন্তের মায়া
তোমাকে স্পর্শ করলো ?
বাতাসে কি সুখের আশ্বাস বয়েছিল,
কে জানে !
অনেক দূরের মাঠে বসন্তের মঞ্জরী
ফুটেছে বোধহয়,—
আমার বুকের তাপে তুমিও কি
তোমার রৌদ্রের পাঁপড়ি ফোটালে ?
তোমার সোনালী স্বপ্নের নদী আমার চুলের ঘ্রাণ
ছুঁয়ে গেলো ;
তোমার অমল জল, স্বপ্নের সেই নদী,
সুখবহ কেবলই আমার ।

বিদেশী কবিতা ঃ

ফর্মোজা

সিন্‌-ওয়েন্‌ চুং

[চীনা ভাষার লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি। বিশ্বকবি কংগ্রেসের বর্তমান সভাপতি ডক্টর সিন্‌-ওয়েন্‌ চুং চীনের মূল ভূখণ্ডের আনওয়েই প্রদেশে জন্মলাভ করেছিলেন (১৯১৪)। ১৯৩২-এ সাংহাইর চাইনিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল-এল. বি, ১৯৩৬-এ জাপানের কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল-এল. বি, ১৯৬৯-এ ইন্টারন্যাশনাল একাডেমী, কালচুরাল ডিপার্টমেন্ট অফ্‌ দি সভ্রেন অর্ডার অফ্‌ আলফ্রেড দি গ্রেট, হল, ইংল্যান্ড থেকে এল-এল. ডি. আর ১৯৭৩-এ লা ইউনিভার্সিটিতে লিব্রে (এশিয়া), করাচী (পাকিস্তান) থেকে লিট্‌. ডি (সম্মান) ডিগ্রি অর্জন করেন। কিছুকাল সাংহাইর ফু তান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার পর সাংহাইর 'সিয়েন-সিয়া ডেলি নিউজ্‌' আর ক্বেইলিনের 'ক্বাংসি ডেলি নিউজে'র মুখ্য সম্পাদক ছিলেন।

ডক্টর চুং চীনা গণতন্ত্রের (ফর্মোজা) জাতীয় এসেম্ব্রির সভ্য, আন্তর্জাতিক পি. ই. এন চীন কেন্দ্রের আর চাইনিজ পোয়েট্রি সোসাইটির ডাইরেক্টর, চাইনিজ আর্টিস্ট অ্যান্ড রাইটার্স এসোসিএশনের পোয়েট্রি কমিটির প্রধান আর চাইনিজ পোয়েটস্‌ এসোসিএশনের সভাপতি। বহু কাব্যগ্রন্থের প্রণেতা ডক্টর চুং বহু আন্তর্জাতিক সম্মান পুরস্কার ও জাতীয় পুরস্কার লাভ করেছেন।

১৯৩৩-এ ডক্টর চুং-এর পিতা-মাতা চীনা কমিউনিস্ট দ্বারা নিহত হয়েছিলেন। কিন্তু চীন-জাপান যুদ্ধের সময় (১৯৩৭-৪৫) তিনি চীনা সৈন্যবাহিনীতে মেজর জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মানিলায় অনুষ্ঠিত প্রথম এশীয় লেখক সম্মেলন (১৯৬২), বেলজিয়মে অনুষ্ঠিত ৮ম আন্তর্জাতিক বাইএনিয়েল অফ্‌ পোয়েট্রি (১৯৬৮), মানিলায় অনুষ্ঠিত কবিদের প্রথম বিশ্ব কংগ্রেস (১৯৬৯) আর সিউলে অনুষ্ঠিত ৩৭তম আন্তর্জাতিক পি. ই. এন. কংগ্রেস প্রভৃতি

বহু সাহিত্যিক সম্মেলনে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা সরকারের আমন্ত্রণক্রমে ডক্টর চুং ঐ দেশগুলি ঘুরেছেন।

মূল চীনা থেকে কবি শ্রীমতী নান্‌সি চাঙ্‌ ইঙের সহযোগে বাঙলায় অনূদিত ডক্টর চুং-এর একটি কবিতা এখানে দেওয়া হল।]

অনামা

তুমি এসেছিলে ছায়াহীন হয়ে
আবার চলে গেছ তুমি
কোনো চিহ্নই না রেখে ;
তবুও আমার বুকের শ্রান্ত প্রদীপটি
কেঁপে কেঁপে উঠেছিল অস্থির আবেগে···
···তুমি কি বাতাস ?

তুমি হেসেছিলে শব্দহীন
কেঁদেছিলে তুমি
কোনো স্বরই না তুলে ;
তবুও আমার আত্মার দীপ্তিময়ী চাঁদ
ম্লান হয়ে গিয়েছিল আঁধার আড়ালে···
···তুমি কি মেঘ ?

অনুবাদিকা ঃ সুজাতা প্রিয়ংবদা

মদেশী কবিতা

পরিমল দে

[উত্তর বাংলার আরণ্যক পাহাড়তলীতে শতাব্দী ধরে বাস কোরছে কোল ভিল, মুণ্ডা, ওঁরাও এই সব প্রবাসী শ্রমিকেরা। অরণ্যভূমিতে এরা মদেশী নামেই সমধিক পরিচিত। করুণতম করুণ দুঃখময় এইসব কালো মানুষের জীবনে রয়েছে প্রেম ভালোবাসা, তবে তার রূপ স্বতন্ত্র।]

[এক]

হায়রে বসন্তেরে বসন্তে
মরদ আমার নেইরে ঘরে

শাওনের জোয়ার আমার এই শরীরে
কে আছিস্ তুই শক্ত মরদ আয়রে আমার শরীর 'পরে

হায়রে বসন্তেরে বসন্তে

[দুই]

সখিরে হায়
একেলা আমি অবেলায়
কোলকাতা বাবুরে ভাবি বেলা অবেলা সারাবেলায়

হায়রে আমার শহরবাবু
তুই কমলা কিনলি পয়সা দিলি
মোর কালো অঙ্গে হাত রাখলি
এমনই এক সাঁঝবেলায়

সখিরে হায় একেলা আমি এই অবেলায়
কোলকাতা বাবুরে ভাবি বেলা অবেলা সারাবেলায়

[তিন]

'সামু' চলে শালবনে কুড়ুল চলে আপন মনে
ফাগুন দিলে মাদল ডাকে রুদি ধাঁ আ তিং রুদি ধাঁ আ
ওরে কাঠুরিয়া তুই এ বেলা ঘরকে যা

ধ্যানে, ব্যবধানে কবি সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের সম্প্রতি প্রকাশিত কবিতার বই। কবিতা পাঠকদের কাছে গ্রহণীয় খবর। দীর্ঘদিন পর একগুচ্ছ কবিতা পড়তে পারার জন্য প্রকাশককে ধন্যবাদ। সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের কবিতায় গভীর দ্যোতনা পরম মমতববোধ বিরাজ করে। কবিতার শরীর তৈরী হয় টানা টানা লাইন দিয়ে। মনে হবে গদ্যের লাইন অথচ ছন্দোময়। একবার পড়লে ইয় না, তারিয়ে তারিয়ে অনেকবার পড়তে হয়। আর্তি বেদনা সুখ দুঃখ সবকিছু কবিতার শরীরে নিহিত থাকে।

কখনো কখনো তা মনকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। কাঙ্ক্ষিত বস্তু সহজেই ক্রমে ক্রমে ভিতরে প্রবেশ করে। কবিতাগুলির মধ্যে নিজের বক্তব্য প্রয়োগ সার্বজনীন বক্তব্যের মধ্যে তোলপাড় করে। এইখানেই কবির সার্থকতা। কবিতার শব্দচয়ন বাক্যগঠন খুব ভারী হলেও পড়তে কোন অসুবিধা হয় না। কোথাও প্রাঞ্জলতার অভাব নেই। বাউল গানের মত একটা ৰিষণ্ণ সুর খেলে খেলে বেড়ায়। ধ্যানে, ব্যবধানে কবিতা গ্রন্থের প্রথম কবিতাটি তো অপূর্ব। এইখানে তুলে দেওয়ার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না।

কবিতাটির নাম 'অসমাপ্ত শর্ত'। মাঠের এপার থেকে ডাক দিলে 'সমর'/ অথচ মাঠের এপারে তা শোনাল/অনেকটা যেন ঠিক 'অমর' এর মতো/প্রায় এক মাইল নীলিমার নীচে/জনশূন্য জ্যোৎস্না, অর্থাৎ গভীর/স্তব্ধতা, আর যতখানি দূরে গিয়ে/ডাক দিলে নামের ভিতর থেকে/দ্বিতীয় আরেক অর্থ ব্যাকুল বেরিয়ে/আসে—আমি/বসন্তের অসমাপ্ত শর্তে আরো বহুদূর ভৌতিক জ্যোৎস্নায় একা ডুবে যাচ্ছি বলে/'সমর' অথবা 'আমরা' শব্দের মধ্যে/চেনা 'মর' ধ্বনিটির দিকে আমার/শরীর—ভরা মর্তকাতরতাগুলি পাঠিয়ে দিলাম/।

বলশালী কণ্ঠের তীক্ষ্ণ ধমক। নিজের ব্যক্তিসত্তার দিকে, নিজের অতি ব্যয়িত অতীতের দিকে এক উজ্জ্বল উপস্থিতি।

আত্মার নিবিড় সান্নিধ্য একাত্মতা প্রবহমানতা এই সবই তাঁর কাব্যের মূল শেকড়। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত বলেছেন—ভেবেছিলাম তোমাকে আর ছোঁব না সন্দেহে (মল্লিকার উদ্দেশে জনৈক শ্মশান বন্ধু) শুধু শব্দ দিয়ে নয় শব্দের

সাহায্যে নির্মিত উপমা চিত্রকল্পের নির্মাণেও দীপ্ত হয়েছে অনুভূতির জগৎ। কল্পনার সজীবতায় প্রাণবান করে তুলেছেন অন্তরঙ্গ পরিবেশকে। মল্লিকা যেন আমাদের পরিচিত আপনজন। এই স্মৃতিচারণা আমাদের অস্তিত্বে বারবার ঝলসে ওঠে। মনপাখী দূরের কলাবতী মেলায় চলে যায়। এই আন্তরিকতা কবি-মানসের অপার সৌন্দর্য। ধ্যানে, ব্যবধানে কাব্যগ্রন্থের মোট ৬৪টি কবিতা স্থান পেয়েছে আর প্রতিটি কবিতাই হয়েছে মনে রাখার মত। প্রচ্ছদশিল্পী বিপুল গুহের কাজ ভাল হয়েছে।

—জীবন সরকার

ধ্যানে, ব্যবধানে/সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-৯। মূল্য ঃ ৪·০০।

২

'সাতজন' কাব্যগ্রন্থটি মুর্শিদাবাদের সাতজন রাগী যুবক কবির তেজী কাব্য-সংকলন। কোন অঞ্চলের সাহিত্য-আন্দোলনের আধুনিকতম রূপটি একজন কবিকে দিয়ে বা একটি কাব্যগ্রন্থ দিয়ে প্রকাশ করা বোধহয় সার্থক হয় না। সেদিক দিয়ে 'সাতজন' কাব্যগ্রন্থটি সাতজন কবিকে এবং মুর্শিদাবাদ জেলার কবিতা আন্দোলনের আজকের মুহূর্তটি প্রকাশে সার্থকতা লাভ করেছে। নান্দিমুখ করতে গিয়ে এই কাব্য-সংকলনের সম্পাদক শম্ভু ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন—এই জেলায় নিয়মিত কবিতা লেখেন, পড়েন, এবং কবিতা নিয়ে সিরিয়াস ভাবনা-চিন্তা করেন এমন অন্ততঃ সাতজনকে আমরা পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব দিতে পেরেছি কেননা এঁদের প্রত্যেকেই এখানে উপস্থিত আছেন স্বনির্বাচিত দশটি কবিতার এক-একটি পৃথক আইডেনটিটি নিয়ে।

এই গ্রন্থের প্রথম অংশের কবি সুশীল ভৌমিক 'তাঁবুহীন দূরত্ব পেরিয়ে' পাঠকের একদম কাছাকাছি চলে এসেছেন। আটপৌরে শব্দের নিঁখুত ব্যবহারে কবিতাগুলো খুবই প্রাণবন্ত ও উজ্জ্বল।

মনীষীমোহন রায় তাঁর কবিতার অংশে 'অন্ধকার পেরিয়ে মানুষ'কে কবিতার আলোকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন। রোমান্টিকতায় ভরপুর এই কবির কবিতা।

'ধূপছায়া নগরের পথে পথে বেগমান অশ্ব' প্রদীপেন্দু মৈত্র দশটি মিসাইল ছুঁড়েছেন কবিতার পাঠকদের উদ্দেশে।

রাজেন উপাধ্যায়ের কবিতার অংশ 'কিছু বৃক্ষ ও দুঃখিত উৎসব'। তিনি সহজ সরল সাদামাটা ভঙ্গিতে কবিতার উত্তরণ ঘটিয়েছেন।

পম্পু মজুমদার নির্বাচিত যুদ্ধে, রক্তের খোঁজ করতে করতে পৌঁছে গেছেন 'নতুন জন্মের চাবুকের অনুষ্ঠানে'। রাগী কবিদের মত কবিতায় বুলেট ছুঁড়েছেন।

জমিল সৈয়দের কবিতা পড়তে পড়তে মনে হলো সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সেই কথাটি 'কবিতা শব্দ শিল্প'। শব্দের ব্যবহারে জমিল সৈয়দ নিখুঁত তীরন্দাজ।

'মানুষকে ভালবাসলেই মানুষের কাছে যাওয়া যায়' এই সার কথাটি কবি শম্ভু ভট্টাচার্যের পাঠকের কাছে আর্তি নয়, মানবিক আবেদনও বটে।

—তপনায়ন ঘোষ

সাতজন/২৫ দিনবাবুর গলি, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

পুরুলিয়া

পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত জেলা পুরুলিয়া। অনেকেই 'খরার শহর' বলেন। কিন্তু এই খরার মাটিতে কবিতা সবুজ এবং কাব্য-আন্দোলন ক্রমশঃ দানা বেঁধে উঠছে। কবিতা নিয়মিত-অনিয়মিত অনেকেই লেখেন ভবিষ্যতেও লিখবেন—তবে কোনো জেলার কবি-সমীক্ষা করতে যেয়ে সমস্ত কবির পরিচিতি দেওয়া অসম্ভব। শুধু এখানে আজ এই বাংলাদেশের পাঠকদের কাছে কয়েকজনের পরিচিতি দেওয়া হলো। যাঁরা বর্তমানে কাব্য-আন্দোলনে যুক্ত।

বীণা বন্দ্যোপাধ্যায়—পঞ্চাশ উত্তীর্ণা এই মহিলা কবি কলেজ জীবন থেকেই বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকায় কবিতা লেখা শুরু করেছেন। এখনও তিনি কোলকাতা থেকে দূরে থেকেও কোনো আলস্যকে প্রশ্রয় না দিয়ে নিয়মিত কবিতা লেখেন—যেমন অনিয়ম করেন না শিক্ষকতায়। তাঁর সাম্প্রতিক প্রকাশিত কবিতার বই "পুরুষের প্রতি নারী"।

সত্যেন্দ্র গুপ্ত—বয়েস চল্লিশের কোঠায়—মৃদুভাষী, এই প্রধান শিক্ষকটিকে কেউ লেখা না চাইলে প্রায় লেখেনই না, কিন্তু যখন লেখেন তখন তাঁর কবিতায় বিক্ষুব্ধ সমাজের ছবি স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

দিলিপ চট্টোপাধ্যায়—বয়েস চল্লিশ ছুঁই ছুঁই হলেও তারুণ্য বর্তমান। সর্বদা হাসিমুখ। সংসার এবং রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষকতা নিয়ে নিয়মিত কবিতা লেখেন। রোমান্টিকতায় তিনি নির্জন।

অমিতাভ—ইনি একপ্রকার মুক্ত পুরুষ। সংসার থেকে দূরে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যে নিযুক্ত। নানা ছদ্মনামে গল্প, কবিতা এবং প্রবন্ধ লিখে থাকেন।

বিমলেন্দু ত্রিপাঠি—এখন বেশ কিছুদিন হ'ল এর লেখা দেখা যাচ্ছে না। কলেজ থেকে পাশ করেই উড়িষ্যার দিকে রেলওয়ে বিভাগে চাকরী করছেন। কবিতায় পরিণত। নষ্টালজিয়ায় ইনি ভুগছেন। বিমলেন্দুর প্রিয় পাঠকেরা তাকে আরও দেখতে চায়—সে সামনে আসুক কবিতা নিয়ে।

সৈকত রক্ষিত—আধুনিক কবিতা আজ যে-রূপে চিহ্নিত সেই রূপ এঁর কবিতায় বর্তমান হলেও তিনি আজ পুরুলিয়া জেলায় কবিতা লিখে অল্প দিনের মধ্যে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়েছেন। অনুভূতির সঙ্গে যে-কোনো চলতি শব্দ নিয়ে কবিতার শরীর বাঁধতে দক্ষ। কবিতায় অন্তর্দৃষ্টি তাঁর বহুদূরে। অনেক সময় তাই অভ্যস্থ পাঠকের কাছে পৌঁছতে পারে না। কলেজের ছাত্র, বিনয়ী, নম্র। কবি পরিচয় বাদ দিয়েই তিনি ভাল বন্ধুর। অনেক সময় তাই বলে ওঠেন, 'আমার ভেতরে, মাটিতে, আমি নই কবি।

অশোক দত্ত—ভীষণ জেদি। উনিশ-কুড়ি বয়েসের এই যুবক কবিতায় কিন্তু রোমান্টিক। কিন্তু রোমান্টিক হলেও বর্তমানকে ছাড়িয়ে তিনি দূরে চলে যান নি। আকারে ইঙ্গিতে তিনি মানুষের কথা বলেন। কবিতার সঙ্গে ছবিও আঁকেন। কলেজের ছাত্র।

মুকুল চট্টোপাধ্যায়—সাম্প্রতিক কবিতার বই "স্বপ্নের শব কাঁধে নিয়ে" সাহিত্যমহলে মূল্য পেলেও এঁর কবিতা পড়তে অনেক সময় আড়ষ্ট লাগে। হয়ত তাঁর কবিতার এটাই বৈশিষ্ট্য।

কল্লোল মজুমদার—'আঠারো বছর বয়স পথ চলতে যায় না থেমে'… সুকান্তের এই কবিতার লাইন মনে পড়লেই আঠারোর এই যুবক, কেমেস্ট্রি অনার্সের ছাত্রটিকে মনে পড়ে যায়। কবিতায় সহজ সুন্দর—সাবলীল। শব্দ-চয়নে অবশ্য সতর্কতা কম।

তরুণ দাশ—কবিতার চেহারায় একদিন ছিল আগুন। আজ সে আগুন নিভে গেছে। কারণ ইনি চার বছর পাশ করে বসে, চাকরীহীন জীবন। তবু কবিতাকে ভুলে যান নি এবং তাই এঁর কবিতার মধ্যে বর্তমান অবক্ষয়ের কথা বারবার প্রতিফলিত হয়।

সুব্রত ভট্টাচার্য—মূলতঃ প্রেমিক কবি—সেই চিরদিনের আকাঙ্ক্ষিত প্রেম তাঁর কবিতায় রূপ নেয়। আঙ্গিকের দিকে লক্ষ্য করলে ভাল হয় সুব্রতর কাছে এই অনুরোধ রইল।

মৃদু দাস—এখনও স্কুলের গণ্ডি পার হন নি। কবিতায় কিন্তু ইনি বালক নন। কবিতা কি এবং কি জন্য জেনে গেছেন বলেই এঁর কবিতায় পরিণতি লক্ষ্য করা যায়।

শান্তি সিংহ—কর্মসূত্রে পুরুলিয়ায়। তাঁর কবিতার বই 'লাল মাটি নীল অরণ্য' পাঠকের প্রশংসা পেয়েছে।

মোহিনীমোহন গাঙ্গুলী—পুরুলিয়া জেলার মণিহারা গ্রামের এই ভদ্রলোকটিকে সবাই চেনেন। গ্রাম থেকে শিক্ষকতা করেও প্রচুর পত্র-পত্রিকায় লেখেন। তবে তিনি আধুনিক হয়েও আধুনিক নন।

কমল চট্টোপাধ্যায়—এগারো বছর 'সাহিত্য বিচিত্রা' সম্পাদনা করছেন আদ্রার এই ভদ্রলোকটি। কবি যেমন খুঁজে বের করেন তেমনি কবিতায় কব্জির জোর দেখা যায়। স্থানীয় নানা অনুষ্ঠানে গান গেয়ে থাকেন। বর্তমানে আধুনিক কবিতা গানরূপে গেয়ে যাচ্ছেন অনেক কবি-সম্মেলনে।

অভিলাষ চট্টোপাধ্যায়—এঁকে চিনতে কারো ভুল হয় না। আদ্রার এই বিশ-বাইশ বছরের যুবক এখনই সমাজকে চিনে গেছেন। কবিতার মধ্য দিয়ে ইনি সমাজের দৈনন্দিন আশা-হতাশা নিয়ে লড়াই করতে চান।

শোভনকুমার সরকার—পুরুলিয়ার জয়পুরে বাড়ী। কথা যেমন মিষ্টি-ভাবে বলতে পারেন তেমনি নিপুণভাবে পরিবেশন করতে পারেন কবিতার কথা।

চিত্ত দাস—বলরামপুর (পুরুলিয়া) থেকে কবিতা লিখে যাচ্ছেন নিয়মিত। সম্প্রতি "জনান্তিকে বলে রাখি" কবিতার বই প্রকাশ করেছেন।

অমিয় পাল—বলরামপুর থেকেই কবিতার সঙ্গে কাব্য-আন্দোলনে যুক্ত। তিনিও কবিতার বই করেছেন "এখন বসন্তকাল"।

নির্মল হালদার—'অন্যদিন' পত্রিকার পুরুলিয়ায় প্রতিনিধি ও সম্পাদক। চারপাশে হাত খুলে লিখছেন। মাঝে-মধ্যেই ঘর থেকে বাহিরে পা বাড়ান। মানুষকে ভালোবাসাই যেন ওঁর ধর্ম।

এই সমস্ত নামের বাইরেও পুরুলিয়া শহর এবং জেলায় কাব্য-আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখতে চান তাঁরা হলেন "ছত্রাক" পত্রিকার সম্পাদক সুবোধ বসু রায়, "আমরা সত্তরের যীশু"র সম্পাদক প্রতুল দত্ত, অপূর্ব স্যান্যাল, অলোক ভাদুড়ি, তাপস পাঁজা, বেণু দেবী, মাধবী দে, কাবেরী মিত্র, অমলপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ফুলচাঁদ দে, কল্যাণ সেনগুপ্ত, প্রতীপ দাশগুপ্ত, বিমলকান্তি ভট্টাচার্য এবং পুরুলিয়া জেলায় বোধহয় প্রথম কবিতার বই প্রকাশ করেন কামাখ্যা সরকার। কামাখ্যাবাবু নিয়মিত পত্র-পত্রিকায় লিখছেন।

ব্লক এল/৩, রেক্স হাউস
পোঃ ও জেলা—হুগলী

মাননীয় সম্পাদক,
শ্রদ্ধেয়,

নবপর্যায়ে প্রকাশিত 'অন্যদিন'এর শরৎ সংখ্যা '৮২ দেখলাম। বেশ ভাল লাগলো। পূর্বের ঘোষণা দেখে ভেবেছিলাম কবিতা হয়ত এবারে নির্বাসনে যাবে। কিন্তু তা না করে কবিতার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা নূতন ধরনের ছোট গল্প দিয়ে আমাদের আশ্চর্যান্বিত করেছেন। বিশেষভাবে প্রেমেন্দ্র মিত্র আর জীবন সরকারের গল্পদ্বয়—ছোট গল্পের আকারের। আপনাদের শুভ প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাই। প্রবন্ধের সংখ্যাটা একটু বাড়ালে ভাল হয় না কি? দেখতে দেখতে নব্বই পৃষ্ঠা পড়া হয়ে গেল। পাঠক হিসেবে আপনাদের সঙ্গে থাকার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। নমস্কার নেবেন। ইতি—

তানাজী সেনগুপ্ত

H-196 Unit—4
Bhubaneswar—7510001

সবিনয় নিবেদন,

শরৎ সংখ্যা 'অন্যদিনে' আমার 'ইচ্ছে হলে' কবিতাটি প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ।

সংখ্যাটির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে 'স্বর্গের তটিনী' কবিতাটিতে এসে হোঁচট খেতে হোল। শ্রীঅসিতবরণ হালদার মহাশয় কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'স্বর্গের পুতুল' কবিতাটির ২টি ছত্র হুবহু নকল করে আপনার পত্রিকায় পাঠিয়েছেন। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'নীরক্ত করবী' গ্রন্থ ১৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

এ-ধরনের অপরাধ ইদানীংকালে অচল হয়ে এসেছে, তা সত্ত্বেও কবিযশ-প্রার্থী হালদার মহাশয় আপনার পত্রিকার অনর্থক অমর্যাদা ঘটিয়েছেন এটাই অমার্জনীয় মনে হচ্ছে।

যাইহোক, আমার কবিতা প্রকাশ এবং একটি সংখ্যা মনে করে পাঠানোর জন্য আর একবার ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি শেষ করছি। ইতি।

নমস্কারান্তে
সন্তোষ দাশ

কবি শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত পরলোকে

বাংলা সাহিত্যের কল্লোল যুগের প্রথিতযশা নায়ক কবি সাহিত্যিক 'পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ' সমেত ১৩৩ খানারও অধিক গ্রন্থের লেখক শ্রীঅচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত বৃহস্পতিবার রাত ৯টা ৫৭ মিঃ তার বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তার বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। নোয়াখালী সদরে জন্মগ্রহণ করে সেখানকার জেলা স্কুলে পড়াশুনা শুরু করেন, পরে ভবানীপুর সাউথ সুবার্বন স্কুল থেকে ১৯২০ সালে ম্যাট্রিকুলেশন, ১৯২৪-এ ইংরাজী অনার্সসহ বি. এ, ১৯২৬-এ ইংরাজীতে এম-এ, ১৯২৯ সালে বি-এল পাশ করেন। ১৯৩০ নীহারকণা দাশগুপ্তার সংগে তাঁর বিবাহ হয়। কর্মজীবনে ১৯৩১ সালে বহরমপুর সদরে মুন্সেফ রূপে তিনি সরকারী চাকুরীতে যোগ দেন, তিনি কবিতা বইয়ের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছিলেন।

পরলোকে কবি শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বর্ষীয়ান কথাশিল্পী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় আর আমাদের মধ্যে নেই। আমাদের কাকাবাবুকে আমরা দেখতে গিয়েছিলাম এই কিছুদিন আগে। সরোজ সাহিত্য পরিষদের তরফ থেকে আমরা কিছু সাহায্য করেছিলাম। অর্থের অঙ্ক সামান্য হলেও আমাদের কাছে তা ছিল পরম মূল্যবান।

শৈলজানন্দ প্রথমে কবিতার মাধ্যমে সাহিত্যে প্রবেশ করেন। পরবর্তীকালে কবি-বন্ধু নজরুল ইসলামের সংগে বাজী ধরে গল্প উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করেন আর নজরুল লিখতে আরম্ভ করেন কবিতা।

প্রথম উপন্যাস 'কয়লাকুঠি' দিয়েই শৈলজানন্দ বাংলা সাহিত্যের জাতবদল করেছিলেন। নীচু তলার কুলি-কামিনের কথা বাংলা-সাহিত্যের এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। বাংলা-সাহিত্যে তাঁর স্থান চিরদিন অটুট থাকবে।

কবি সম্মেলন

২৫শে জানুয়ারী সকাল ৯টার সময় তালতলা পাবলিক লাইব্রেরীর কবি-সম্মেলন হয়ে গেল। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন—ডঃ সুশীল রায়, সভাপতি ছিলেন বিজয়া মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শরৎ মুখোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, নবনীতা দেবসেন, প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায়, জীবন সরকার, অরুণাভ দাশগুপ্ত, বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায়, দেবোপম চক্রবর্তী, শিশির রায় নাথ, প্রদীপ গঙ্গোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে।

আধুনিক কবিতার গীতিরূপ পরিবেশন করেন ঋষিণ মিত্র। কবিদের মধ্যে ছিলেন—জীবানন্দ দাশ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ও জীবন সরকার।

রানার পত্রিকা আয়োজিত কবি সম্মেলন

গত ডিসেম্বর মাসে 'বয়েজ ওন' লাইব্রেরী হলে এক কবি সম্মেলন হয়ে গেল। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করলেন ইন্দ্রজিত বসু ও মিলন দাশ। সভাপতি ছিলেন—কবি কৃষ্ণ ধর।

কবিতা পাঠ করলেন—প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, শিবশম্ভু পাল, অজিত মুখোপাধ্যায়, বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবন সরকার, অরুণাভ দাশগুপ্ত, অশোক পোদ্দার এবং আরো অনেকে।

সংগীত পরিবেশন করেন—গৌতম সেনগুপ্ত, তৃপ্তি বসু, দ্বিজেন দাশ এবং আরও অনেকে। আধুনিক কবিতার গীতিরূপ পরিবেশন করলেন—ঋষিণ মিত্র।

গল্প এক দশক

১৫ই ফেব্রুয়ারী রবিবার ৩টার সময় 'ডিউক' রেণ্টুরেন্টে এক গল্পের আলোচনা হয়ে গেল। উদ্যোক্তা ছিল 'অব্যয়' পত্রিকা। অব্যয় পত্রিকা থেকে

প্রকাশিত হল একটি উল্লেখযোগ্য গল্পের সংকলন। সম্পাদনা করেছেন—আশিস ঘোষ ও অতীন্দ্রিয় পাঠক। আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন—অতীন্দ্রিয় পাঠক, আশিস ঘোষ, সুব্রত সেনগুপ্ত, সুব্রত নিয়োগী, অরুপরতন বসু, রমানাথ রায়, প্রলয় সুর, চণ্ডী মণ্ডল, বরুণ গঙ্গোপাধ্যায়, অমল চন্দ, শেখর বসু, কল্যাণ সেন, সুভাষ ঘোষ, সুনীল দাস, হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়, রঞ্জিত রায়চৌধুরী, জীবন সরকার এবং আরো অনেকে।

শোক সংবাদ

প্রথিতযশা চিত্র-পরিচালক ঋত্বিক ঘটক মারা গেলেন অনেকদিন রোগ ভোগের পর। 'অযান্ত্রিক' ছবিটি দেখে দারুণ মুগ্ধ হয়েছিলাম।

বন্ধুশিল্পী বিশ্বরঞ্জন দে আমাদের মধ্যে নেই এটা যেন বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। এমন করে চলে গেলে কেন? উত্তর চাই বিশ্বরঞ্জন।

গত পঁচিশে ডিসেম্বর তরুণ কবি উমাশংকর বন্দোপাধ্যায় মাত্র ৩০ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট তরুণ কবি আবুল হাসান আর নেই। গত পঁচিশে নভেম্বর ভোরবেলায় 'পৃথক পালংকে' শুয়ে হঠাৎই পেরিয়ে গেলেন অন্তবিহীন পথ।

'অন্যদিনের' সংকলন গোষ্ঠীর তরফ থেকে এদের আত্মার শান্তি কামনা করি।